আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম

আনসারউদ্দিন

আজকের ভোগবাদী ব্যবস্থার মায়াবী হাতছানিতে গ্রামীণ জনসমাজ যখন ধবস্ত বিপর্যস্ত, তখন স্মৃতির সরলরেখা ধরে পৌঁছে যাই নিজস্ব শৈশবে। তার সেই মুক্ত প্রকৃতি নদী মাঠ আর আকাশের বেদনার্ত সুর অনুভব করি নিজস্ব তন্ত্রীতে। সময়ের সঙ্গে পাল্টে যায় তার অনুষঙ্গ। পাল্টে যায় জীবনবোধ, অভিজ্ঞতা আর সংস্কৃতি। পাল্টে যায় মানুষ। কিন্তু স্মৃতি স্মৃতিই থেকে যায়। স্মৃতি হচ্ছে মানব মনের এক অলিখিত ইতিহাস।

শৈশবের কথা মনে এলেই যে গ্রামীণ জনজীবনের চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আজকের সঙ্গে তার অনেক অমিল। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের ঘন বাবলা গাছের ভিতর থেকে রাখালিয়া বাঁশির মনমাতানো সুর আর শোনা যায় না; তেমনি দেখা যায় না বর্ষাস্নাত সবুজ গোচারণভূমিও। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির যুগে জমি জিরেতের পাশ ফেরার সময় কই। প্রসব বেদনা উপশমের আগেই আরেক ফসলের গর্ভধারণ। জমি হয়ে ওঠে বিবর্ণ হলুদ। মাটির স্বাদ অম্ল। কখনো আশটে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জীর্ণ বিষময় ঝাঁঝ। রোয়ানো ধানগাছ পাণ্ডুবর্ণ পাতায় অজস্র ছিটে দাগ নিয়ে ঝিমোতে থাকে। কৃষিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্তা বলেন --- এন. পি. কে - এর অনুপাত মেনে জমিতে সার দেবেন।

এন. পি. কে কী গো মশায় ? একটু খুলে বলুন। একটি কৃষি বিষয়ক সেমিনারের প্রশ্নোত্তর পর্বে একথা জিজ্ঞাসা করেছিল লিঙ্গডোবার গোবর বাগ। তিন বিঘে জমির আধা চাষি। এসেছে সেমিনারে। এরকম সেমিনার বিভিন্ন সার কোম্পানি প্রয়াশ গ্রামাঞ্চলে করে থাকে। রাসায়নিক সারের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করে কোম্পানির সারের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। আর চার হিসাবে সভা শেষে ছোট্ট একটা মিষ্টির প্যাকেট। আলোচনায় অংশ নেন বিডিও, এডিও, পঞ্চায়েত মেম্বার, কোম্পানির জোনাল ম্যানেজার। আমরা যারা ওই সেমিনারে হাজির ছিলাম তাদের প্রত্যেকের প্রশ্নই গোবর বাগ করেছিল। কোম্পানির ম্যানেজারবাবু বলেছিলেন --- এন. পি. কের অনুপাত হল ইউরিয়া ফসফেট ও পটাশ-এর প্রয়োজনীয় অনুপাত। এগুলির ব্যবহারের তারতম্য ঘটলে, পাতায় ছিটে দাগ ধরে, গাছ হলদে হয়ে, শিকড় পচে যায়, সার্বিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। বুঝলেন? বলে তিনি সভায় উপস্থিত চাষাভুষো মানুষগুলোর উপর প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন। প্রশ্নের ভারে সভাসুদ্ধ মানুষ যখন হাঁসফাঁস করছি তখন ম্যানেজারবাবু একটি ছোট্ট গল্প বললেন।

স্বামী-স্ত্রী আর তাদের বছর বারো বয়েসের ছেলে খেতের কাজে গিয়েছে। কাজ শেষ হতে রাত নেমেছে। ঘোর অমাবস্যার রাত। ফেরার রাস্তায় বন্য জন্তু জানোয়ারের আক্রমণের ভয় আছে। মাঠ থেকে কে আগে ফিরবে বলতে পারেন?

আবার একটা প্রশ্নের অস্বস্তি। আমরা ঘামতে শু করেছি। কেউ বলল, বাবা। কেউ বলল, ছেলে। গোবর বাগ বলল, বাড়ি যেয়ে রান্না করতে হবে যখন বউটাই আগে ফিরবে।

আন্দোজে ছুঁড়ে দেওয়া প্রশ্নের উত্তরগুলোর কোনোটাই যখন লাগসই হল না তখন কোম্পানির ম্যানেজারবাবু বললেন স্ব

ামী স্ত্রী আর তাদের ছেলে এক-সঙ্গেই ফিরবে হাত ধরাধরি করেই। ঠিক কিনা?

আমরা সবাই সমর্থন জানালাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, একসঙ্গেই।

তেমনি ইউরিয়া ফসফেট পটাশ এক সঙ্গ সমান অনুপাতে দিতে হবে। বুঝলেন এবার?

না বুঝবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না কোম্পানির ম্যানেজারবাবুর এমন আকাট গল্পের দৃষ্টান্তে। কৃষিতে মান্ধাতা অ ামলের গোবরসার জৈব সার হয়ে গিয়েছে। সাবেকি কেলেসোনা হেতেমাউড়ি রাডিমল, খঞ্জরমণি ধানের বীজ আর কে াথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন আই আর এইট, মিনিকি, মেঘা ফিফটির যুগ। আর তার হাত ধরে এন পি কে-এর অনুপাত। খেতের ফসল বেচে চাষি কেনে অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া ফসফেট পটাশ, তেমনি কেনে একালাঙ্গ হিনোসান ওতস াদ নামের কীটনাশক। আর এভাবে বস্তা বস্তা রাসায়নিক সার কীটনাশক কিনতে কিনতে ফতুর হয়ে যায়। সে চেয়ে থাকে বহুজাতিক সার কোম্পানির সেই বিজ্ঞাপনের দিকে। যেখানে একজন সফল চাষি তার সবুজ খেতের ভিতর ইউরিয়া বস্তা সামনে করে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই ব্যর্থ চাষি যার খেতের ধান রাসায়নিক খাদ্যের অভাবে হলদে হয়ে গিয়েছে, পাতায় অসংখ্য ছিটে দাগ নিয়ে ধুঁকছে, সে তখন এক স্বপ্নের ঘোরে পা পা করে এগিয়ে বিজ্ঞাপনের সারের বস্ত ায় হাত রাখে। কিন্তু কিছুতেই তুলতে পারে না। তার দু'চোখ ছাপিয়ে ধারা নামে। আর এতেই বুঝি বস্তার তাবত ইউরিয়া গলতে শু করে।

এবার একটা অন্য অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত বলি।

ষাটের দশকের শেষ দিকে, তখন আমি নেহাতেই শিশু বলা যায়। বয়স আনুমানিক আট কিংবা নয়। তখন আমার খাৎনা অর্থাৎ লিঙ্গমুণ্ডের চর্মছেদন। সময়টা ফাল্গুন মাস। গ্রাম্য ভাষায় টানের মাস। কাটা ঘা এসময় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। যে কারণে এখনো ফাল্গুন মাসে বেশিরভাগ, খাৎনা করা হয়। খাৎনাকে আবার শাস্ত্রমতে সুন্নতও বলা হয়ে থাকে। আ ল্লার আদেশকে যেমন ফরজ বলা হয় তেমনি হজরত মহম্মদের নির্দেশকে বলা হয় সুন্নত। সমাজের মানুষকে জানান দিয়ে ছোটো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সুন্নত পালন করা হয়। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের দাওয়াৎ করে নিয়ে আসার রেওয়াজ অ াছে। ওই আত্মীয়রা বাড়ি থেকে পিঠে পুলি বানিয়ে নিয়ে আসে। আর আনে মুরগি। খাৎনার শিশুর জন্য আসে নতুন জ ামা পেন্টুল গামছা। কেউ আনে সোনার আংটি। ছেলের মামা হয়ত আদরের ভাগ্নের জন্য একটা সাইকেল উপহার হিস াবে নিয়ে এল। তাছাড়া আছে মাইকের গান --- বক্সে হিন্দি গানের মাতামাতি। রাতে ভিডিও প্রদর্শনী। পাঁচ গাঁ থেকে লোককুটুম আসার সুবাদে গোটা গ্রাম ব্যেপে রীতিমত অনুষ্ঠান। বড়ো গাঁয়ে অন্তত দশ বারোটা গ কাটা হয়। কোনো কে ানো গাঁয়ে এ উপলক্ষ্যে হাডুডু-দড়ি টানাটানির প্রতিযোগিতা হয়। বিয়ে আর খাৎনার মধ্যে তফাত এই যে, খাৎনায় বউ আসে না। এটাকে বলা যায় যৌনযাপনের স্বীকৃতি । এই প্রক্রিয়ার রূপায়াণ ঘটাতে অন্তত পনের বিশ দিন আগে ওস্তাদকে দাওয়াৎ দিতে হয়। কারণ একজন দক্ষ ওস্তাদ দাওয়াৎ মঞ্জুর করলে তবেই দিন ধার্য হয়। আমার যিনি খাৎনা করেছিলেন তার নাম লোকমান খলিফা। গাঁয়ের মানুষ ওস্তাদকে হাজাম বলে থাকে। এই খলিফা সাহেব ষাট বছর ধরে আড়াইশো মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামে খাৎনার কাজ করে গেছেন। জীবনের শেষ পাঁচ বছর অন্ধত্ব নিয়েও নাকি ওই পবিত্র কাজটি সম াধা করেছেন।

একজন দক্ষ থাৎনাকার হিসাবে লোকমান খলিফা কিংবদন্তি হয়ে আছেন। তিনি আমাদের বংশের তিন পুযের খাৎনা করেছেন। শেষ বয়সে তাঁকে দূর গ্রাম থেকে গোর গাড়ি ভাড়া করে আনতে হত। কেউ একজন লাঠি ধরে বাড়ি বাড়ি নিয়ে যেত। শিশুর গোপনাঙ্গে হাত দেওয়া মাত্র তিনি বুঝে নিতে পারতেন সেটি খাৎনার উপযুক্ত হয়েছে কি না। লিঙ্গ মুণ্ডের পূর্ণ বিকাশ না হলে শলা ঘোরাতেন না। শলা ঘোরানোর ব্যাপারটা ভীষণ যন্ত্রণাদক। একটি স কাঠি লিঙ্গমুণ্ডের চ

ারপাশে ঘুরিয়ে আচ্ছাদিত চর্মকে অপসারিত করা। সে সময় শিশুর আর্ত চিৎকারে কান পাতা দায়। কখনো সখনো তার দাবনায় জোর চাপ্পড় মেরে শাসন করা হয়। কিংবা হুমকি দেওয়া হয় --- এবার চেল্লালে ছাই পেড়ে জবাই করব কিন্তু। এই ওস্তাদ লোকমান খলিফা তাঁর ষাট বছর বয়েসে কত হাজার লিঙ্গমুণ্ড চর্মছেদন করেছেন হিসাব করা মুসকিল। মরার আগে শুনেছি ভীষণ আক্ষেপ করে গেছেন এই বলে যে শেষ বিচারের দিন নাকি তাঁকে আবার ছুরি হাতে কবর থেকে উঠতে হবে। কারণ যেসব মুসকিল শিশু খাৎনা হবার আগেই মারা গেছে তাদের সবার খাৎনা করতে হবে। নইলে খোদ ার ফেরেস্তা তাদের কিছুতেই বেহেস্তের মধ্যে ঢুকতে দেবে না।

ছোটোবেলায় খাৎনার ব্যাপারে আমার ভীষণ ভয় ছিল। যদিও তখন আমি উপযুক্ত হয়ে উঠিনি কিন্তু গ্রামে কোনো পাড় ায় ওস্তাদ বা হাজাম এসেছে শুনলে বাড়ি ছেড়ে পালাতাম। কখনো ঘন আইরি খেতের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতাম। আর ত ারই ফাঁক ফোঁকর দিয়ে গাঁয়ের দিকে সতর্ক নজর রাখতাম। অপরিচিত মানুষজন দেখলেই ওস্তাদ ভেবে আরো মাঠের ভিতর ঢুকে যেতাম। নতুবা দূরে নদীর ধারে একাকী বসে থাকতাম। আর ঘন ঘন পিছু ফিরতাম। মনে মনে তৈরি থাকতাম কোনো ওস্তাদ ছুরি হাতে এদিকে ধাওয়া করলে ঝাঁপিয়ে পড়ব নদীর জলে।

আমার এমন ভাবগতিক দেখে বাড়ির লোকেরা ভীষণ চিন্তায় ছিল। আমার খাৎনার জন্য আত্মীয় স্বজনদের নেমন্তন্ন করা হয়েছে বাড়িতে খলিফা এসে বসে আছে অথচ আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। এক দঙ্গল ছেলেপুলে ছুটল আমার খোঁজে। শেষ পর্যন্ত তারা আমাকে আইরির খেতের জঙ্গল ঘেরাও করে ধরে আনলে। আমার গায়ে হাত দিয়ে লোকমান খলিফা বললেন, ছেলের গায়ে যে জ্বরে খই ফুটছে। এত জ্বরে অস্ত্রচালনা ঠিক হবে না। সামনের বার ব্যবস্থা করে দেব।

একথা শোনার পর লোকমান খলিফার গায়ে গা লাগিয়ে সারাদিন জ্বরো শরীরে বসে থাকতে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু সামনের বার আমার কোনোমতেই ছাড়ান নেই। খাৎনার দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল ততই আমার গলা শুক াতে লাগল। কাউকে না বলে দু'কোশ দূরে পালিয়ে গেলাম মামার বাড়ি। মামা যে মুসলমান তখন অতটা তলিয়ে বুঝিনি। খবর পেয়ে আমার দুই মামা আমাকে পরদিন এর রকম বেঁধে বাড়ি নিয়ে এল। আমি চাইছিলাম এ অবস্থায় আব ার জ্বর আসুক। আমার দাদু ভীষণ তম্বিগম্বি শু করলে, শালা, বেটা ছেলে হয়ে পালিয়ে বেড়াচেছ। এখন ছুরিতে কাটবে। আর দু'বছর পরে যে করাত চালাতে হবে।

সেদিনই আমাকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হল। মা আঁচলে চোখের জল মুছে দুটি দুটি খেতে দিত। খাবার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিল না। মা বেরিয়ে এলেই বাবা খিল তুলে দরজায় হেলান দিয়ে লাঠি হাতে বসে থাকত। তখন আমার ক াছে তা কেবল শাস্ত্রীয় ব্যাপারই না, যেন শহিদের প্রস্তুতি। কীভাবে নিজেকে যে অন্ধকার ঘরের মধ্যে সামলে নিয়েছিলাম ত া ভাবতেও পারিনি। দু'দিন পরে খাৎনার দিন যখন আমাকে নতুন গামছা, লাল ডোবা আর চোখে কাজল পরিয়ে নিয়ে আসা হল লোকমান খলিফার কাছে, একটুও ভয় পাইনি। আমি কেবল চাইছিলাম খলিফা ছুরি নিয়ে যা কিছু কক, যেন করাত আমার কথা না বলেন। খলিফা সাহেব তখন ন্যাকড়া পুড়িয়ে ছাই তৈরি করছেন। বাইরে কুলকাঠের আগুন জ্বলছে। ঘরের বারান্দায় বিছানা পাতা। তার উপর মায়ের হাতে বোনা নক্সা করা কাঁথা। শিথানে এবং দুপাশে দুটি বা লিশ। যেখানে খাৎনা শেষে আমাকে ভীষণ যত্নের সঙ্গে শোয়ানো হবে। ন্যাকড়া পোড়ানো শেষ হলে আমাকে পশ্চিমমুখে া করে ধামার উপর বসানো হল। মেজোমামার কাফোরের দিল। আমার দুই হাত দুই ঠ্যাং-এর মধ্যে দিয়ে গলিয়ে পিছন থেকে সাপটে ধরলেন। লোকমান খলিফা বার দুই আমার শিথিল অঙ্গটা নাড়াচাড়া করে বলে উঠলেন এ যে কলার খে াসার মত জুড়ে যাচ্ছে গো। আমার চোখ বাঁধা হয়েছে নতুন গামছায়। নীচে কচি কলাপাতার অস্তিত্ব অনুভব করি। তার নীচে লুকানো সেই মহাঅস্ত্র। বুঝতে পারি শলা ঘোরানো থেকে রেহাই পেলাম। আমাকে বলা হল খোকা কলমা জান?

আমি কাঁপা গলায় বললাম, লা এলাহা - বল - ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলউল্লাহ।

কলমা শেষ হতেই শুনি, ওই দ্যাখ, মাথার উপর ফিচিং পাখি। চোখবন্ধ অবস্থায় আমি মাথায় উপর তাকাই। আর তখনই আশর্চ্য নিপুণতায় আমার লিঙ্গের চর্মছেদন অনুভব করি। আমার মানসিকতায় ছিল শহিদের শপথ। যার ফলে সুসজ্জিত বিছানায় আমি লক্ষ্য করি ক্ষতের চার পাশে পোড়া ন্যাকড়ার বেষ্টনী। দুই মামা ছোটো ছোটো বালির পুঁটুলি কুল কাঠের আঁচে গরম করে চারপাশ সেঁকে দিচ্ছে পরম যত্নে।

এখন অবশ্য খাৎনার আগে গায়ে গঞ্জের কোন হাতুড়ে ডাক্তারের কাছ থেকে নেওয়া হয় টিটেনাস টক্সাইডের ভ্যাকসিন। তার সঙ্গে বিভিন্ন কোম্পানির দ্রুত ঘা শুকানো অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেট ক্যাপসুল। ছাইয়ের পরিবর্তে হালকা ব্যান্ডেজ। পাঁয়ত্রিশ বছর আগে যে ওসতোদের মজুরি ছিল পাঁচ সিকে আর একটি গামছা, এখন সেই মজুরি পঁচাত্তর থেকে দেড়শো টাকা। এর উপরি আছে বকশিস। কম নেওয়ার কথা বললে ফ্যাকফেকিয়ে ওস্তাদ হাসে ---- পঁচাত্তর টাকা বেশি কী হল? এই ছেলে যখন বিয়ে যুগ্যি হবে তখন যে লাখ টাকার পণ হাঁকাবে। খাৎনা না দিলে সমাজে কেউ মেয়ে দেবে?

খাৎনার সামান্য ক্ষত শুকোতে সে সময় প্রায় দু মাস সময় লাগত। আমি যখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি তখন আমার ছেদনের কাজটি হয়েছিল। দুমাস পরে যখন বাবা সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে গেল তখন শহর থেকে নতুন আসা মাস্টারমশাইকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনি অনুপস্থিতির কারণ। তিনি মুসলমানি বোঝেন না। খাৎনা ও বোঝেন না। বাবা বললে---সুন্নত হয়েছে ছেলের। শুনে বললেন উনি, দুমাস ধরে সুন্নত হল? এরপরের বার সুন্নত হলে কিন্তু ইস্কুল থেকে বিদায় জানিয়ে দেব। বাবা শেষ অবধি আমার কোমর থেকে পেন্টুল নামিয়ে দিলে।

তারপরে কতদিন কেটে গেছে। এখন ভাবি মাঝে মাঝে গ্রামে বসবাস করার সুবাদে এখানকার জনসমাজের জীবনযাত্রার নানান পরিবর্তন। তাৎক্ষণিকভাবে হয়ত বিশেষ সময়ের ব্যবধানে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আজ থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে গ্রাম বাংলায় ব্যাপক বোরো ধান চাষের প্রসার ঘটেনি। মাঠে স্যালো ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে সেচের ব্যাপকতাও লাভ করেনি তেমন। প্রধান খাদ্য ফসল বলতে আউশ ধানকেই বোঝাত। ভাদ্র মাসে এই ধান পাকলে ঘরে ঘরে নবান্নের উৎসব হত। চোত মাসে রবিশস্যের পর আউসের জমিতে পর পর লাঙল চালিয়ে জমি তৈরি করা হত। তখন না ছিল ট্রাক্টর, না কলের লাঙল। মিলিজুলিভাবে চাষিরা পরস্পরের জমি চষত। একে বলা হত গাঁথা। যে চাষি বন্ধ্যা তাকে কেউই গাঁথায় নিত না। কারণ সে যে-জমিতে হাল চষবে সে জমিও বন্ধ্যা হয়ে যাবে। তাকে গাঁথায় ফিরতে হলে পুনরায় বিয়ে করে সন্তানের জন্ম দিতে হবে। আমি আমার পাড়াতুতো বক্কার চাচাকে জানি। চাচার জমি ছিল বিঘে দশেক। তাকে একা লাঙল বইতে দেখেছি পৈতে ছেড়াঁ ভাতাড়ির মাঠে। তার গায়ের রং যাচ্ছেতাই কালো। গাঁথায় ফেরার জন্য তিনবার বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিল। যদি কেউ প্রশ্ন করত হ্যাগো বক্কর মিয়া, ছেলেপুলে নাই বা হল, তা বলে তিনটা বিয়ে? বক্কর চাচা উত্তর দিতেন --- হকরোজ এক তরকারিত ভাত রোচে? তা সেই চাচার কপাল মন্দ বলতে হবে। তিন বউ এক সঙ্গে গর্ভবতী হল। তারপর সেই যে শু হল শেষ মেশ তেরোটা মেয়ের বাপ হল বক্কর চাচা। একটাও পুত্র সন্তান জন্ম দিতে পারেনি, মেয়েগুলোর গায়ের রং ময়লা। তেরটা মেয়ের বিয়ে দিতেই জমিজায়গায় পাখনা গজাল। সংসারে অভাব অভিযোগ, তিন বউয়ের তরজা লেগেই ছিল। না খেয়ে চাচার ও হেন তাগড়া শরীড়টা দিনে দিনে চিমসে হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত অম্বলের গি হয়ে ঘরের পিছনে বেলগাছে গলায় দড়ি ঝোলাল।

তবে যে গাঁছায় কথা বলছিলাম -- চোত মাস নাগাদ জমি চষার কাজ শেষ হত। ফাঁপালো খেতের ভিতর যথেষ্ট আলো আর
বাতাসের অবাধ আনাগোনা। এতে মাটি বেশ নরম থাকে। হাল চালনার সময় যদি গোর পায়ে ফাল গিঁথে যায় তখনই শু হয় ঝাড়ান

মন্তর ---
গোর পায়ে লাগল ফাল
রত্ত বেলো টাটকা লাল।
লাল রত্ত লালমাটি বসুমতীর বেটাবেটি
মাথায় হাত মাথায় হাত গো পদে প্রণিপাত।
হেই রত্ত থেমে যা শূল টাটানি কমে যা।
পাতনায় দেব খলের ছিটে
পান্তাভাতের আমিনি মিঠে
হেই বলদ তুই টানরে হাল
লাঙল আজ না বইলেও বইবি কাল।

ঝাড়ান মন্তর শেষ হলে হালের কৃষাণ হাতের পাচন বার তিনেক জোয়ালের উপর দিয়ে ছুঁড়ে দেয়। তারপর সেই পান ব াখালি হাল লাগা গকে শুকিয়ে শু হয় চাষ। চাষি বউ অবশ্য আগামী বছরের বপনের জন্য কুঠুরিতে রেখে দেয় বীজ ধান। হাজার অভাব অনটন হলেও বীজধান সে কখনো খাবার হিসাবে ব্যবহার করে না। বছরের বিভিন্ন সময়ে পোকা বা ছত্র াকের আত্রমণ থেকে রেহাই পেতে দশ বারোদিন তেজালা রোদে শুকিয়ে নেওয়া হত। বারবার কুলোয় ঝেড়ে চিটে ব াগড়া ধানগুলোকে খুঁটে আলাদা করে মাটির কুঠুরির মধ্যে সযত্নে রেখে দেওয়া হত। ছোটবেলায় মা কাকিমাদের বলতে শুনেছি বীজধান হল বিষ ধান। খেলে অকল্যাণ হয়। পথের ফকির হয়ি যেতি হয়। প্রথম যেদিন জমিতে বীজ বীজভাত। অবশ্য আগের রাতে কোথাও কোথাও কৃষক রমণীর গর্ভে বীর্য নিক্ষেপের মাধ্যমে জমিতে বীজ পত্তন শু করা হয় এক কাঠ া ধানবীজ বের করে নিত। কাঠার উপর রাখা হত সামান্য সিঁদুর নুন আর তেল। পিছনে বীজের বস্তা সমেত গাঁথার চা ষিরা। চাষি বউরা প্রথমে চষা খেতের ধুলো মাথায় আর জিভে ঠেকিয়ে সারিবদ্ধভাবে আল পরিত্রমা করত আর সেই সঙ্গে সমস্বরে গেয়ে উঠত ----
মা লক্ষ্মী আছিস কোথা
একবার উঠে দে দেখা
মরদ মোদের করছে ধানের চাষ
গোলার তলে নেইকো ধান
কী খেয়ে বাঁচবে প্রাণ
ক্যাম্নে মোরা কাটাই বারোমাস।

সুর করে এই ছড়া গাইতে গাইতে চাষি আল পরিত্রমণের কালে তেল নুন সিঁদুর মাখানো ধানবীজ চারভিতে ছড়িয়ে দিত। তারপর বীজ ছড়াত গাঁথার চাষি। শেষবারের মতো হাল চালিয়ে ধান বপনের কাজ শেষ হত। বাড়ি ফিরে হাঁস মুরগি, সম্পন্ন চাষিদের ক্ষেত্রে খাসি ছাগল কেটে রীতিমত জাঁকালো অনুষ্ঠান। ভোজের এ রকম অনুষ্ঠানকে বলা হত বীজভাত। এ অনুষ্ঠানে গাঁয়ের আত্মীয় স্বজনদেরও নেমন্তন্ন করা হত। মুসলমান সমাজে মসজিদের ইমাম সাহেবকে বিশেষ দাওয়াৎ করার রেওয়াজ ছিল। তিনি ওজু করে নামাজের পাটিতে বসে গৃহস্থের কল্যাণার্থে পবিত্র কোরান শরীফ পুরে করতেন। তৃপ্তিসহকারে ভোজনান্তে বকশিসের টাকা পাঞ্জাবির পকেটে পুরে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে চলে যেতেন।

বোশেখ মাসে কালবৈশাখীসহ এক ছপ্পর জোর বৃষ্টি হলে আউশের জমিতে বোনা বীজ অঙ্কুরিত হত। এরকম চারা ধানকে জাওলা বলে, বারবার কয়েক পশলা বৃষ্টি হলে মাটি ফুড়ে বেরিয়ে পড়ে, দুর্বো মুথো শ্যামা ময়না সমেত আরো নান ানতর ঘাস। এরকম ঘাসের মজলিস দেখালে চাষি মানুষের মাথায় হাত। এক বিঘে জমি নিড়ানি দিতে বিশ মানুষের ঘাম ছোটে, তেষ্টায় কল্জে ফাটে। সকালে পান্তোভাতের আমানি গিলে গাঁয়ের তাবৎ মুনিষ নিড়ানি হাতে বেরিয়ে পড়ত।

সমস্ত মাঠের আল ব্যেপে সারিবদ্ধ মানুষের মিছিল। তাদের মাথায় টোকা হাতে নিড়ানি। নিড়ানিরও ছিল রকম ফের। কোনোটি কলমিলতা, চাঁদাপাতা ও কোল চাঁদা আবার কোনোটি একপাতা বেলপাতা। গৃহস্থ চাষির হাতে আগুনের হাঁড়ি তামাকের চোঙা, হুকো। মুনিষের দল যখন সজোরে হুঁকো টানতে থাকে আর তার ধোঁয়া লতিয়ে উড়িয়ে যায় গাঁয়ের কিনারে তখন গৃহস্থ চাষি আলের উপর দাঁড়িয়ে সজোরে আজান হাঁকায়। শয়তান যেমন মসজিদের আজান শুনে সত্তর মাইল দূরে পালিয়ে বাঁচে, তেমনি ঘাসের বুকেও ভীতি সঞ্চার হয় বলে বিশ্বাস। এখানে ঘাস হল শয়তানের প্রতীক। মুনিষের দলও ঘাসের বিদ্ধে লড়াই করার সাহস পায় শক্তি পায়। দখিনের মৃদু বাতাস তাদের ক্লান্ত দেহে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করে তখন তাদের নাভিমূল থেকে উৎসারিত গানে দশদিক মুখরিত হয়। এমন একজন গানপাগলা মানুষের নাম দিগ্‌দারি শা। ছোটোবেলায় তার গান শুনতে প্রায়ই মাঠে বেরিয়ে পড়তাম চুপিসারে। কখনো কালু গাজির কিস্যা, গোলাবাকওয়ালির গল্প। গল্পের মাঝে মাঝে গান। গানের গলাটা ছিল চমৎকার। অন্য মুনিষেরা নিনানি চালাতে চালাচে তার গানের দোহারি করত। শাহর গান তন্ময় হয়ে শুনতাম। শুনতে শুনতে এক অপূর্ব আচ্ছন্নতার মধ্যে অন্য এক স্বপ্নের জগতে হারিয়ে যেতাম। দিগ্‌দারি শা গাইত ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, পল্লীগীতি থেকে বাউল জারি ধুয়ো গান। এইসব শ্লেষ রসাত্মক গান এখনো কেউ কেউ গেয়ে থাকে। যেমন ন'পাড়ার ফকির বিশ্বাস-এর মুখে শুনি ধুয়োগানের পদ ----

বাঁশ চেয়ে কঞ্চি মোটা হয়েছে কলিতা -----
বাপ চেনে না এখনকার ছেলে।
আবার হাঁটু ভাঙা স্বভাব মোল্লার
বাবাকে যা তা বলে
ছয়রদ্দি ভেবে বলে গো ছেলে জগত মাতাল।
কিংবা,
আমার ঐ বাবা ভিন্ন তোর মা'র নেই বাহার
মণ্ডল বাড়ি ভানা ভেনে খায়
আবার মাথায় উপর থাবা দিলে
ছ গাড়ি ছাই উড়ে যায়।
আঁড়ের বিটা পেট গোবিন্দ গো
ও সে খুঁড়িয়ে মরদ হয়।

সূর্য মাথার উপর এসে ষোল ঘোড়ার তেজে যখন হানা দেয় তখন দিগ্‌দারি শাহদের গান থেমে যায়। সকালের পান্তাভাতের আমানি পেচ্ছাপ হয়ে বেরিয়ে যেতে কতক্ষণ। তারা তখন নিড়ানি থামিয়ে গাঁয়ের উপান্তে ঘন ঘন উঁকিঝুঁকি মারে কখন গৃহস্থ জলখাবার নিয়ে বের হয়। অনেকের সকালে ভাত আমানিও পেটে পড়ে না। সেইসব অভাবগ্রস্ত পরিবারে ভাইয়ে ভাইয়ে বাপবেটায় মুনিষে খাবার লড়াই চলে। জলখাবার ছাড়াও দিনে অন্তত একবার পেটপুরে খেতে পাবে। কিন্তু বাড়িতে থাকলে হা অন্ন উপবাস। গৃহস্থও ভীষণ চালাক। জলখাবার পরিমাণে বেশি হলে মুনিষের দল খাবার নামে জাবর কাটবে। সেজন্য জন পিছু এক আঁজলা মুড়ি কিংবা খান তিনকে গমের টি; একটু গুড় কিংবা আলু ঘন্ট। এসব গোগ্রাস গিলে ঢকাঢক জল খেয়ে খেতের কাজে নেমে পড়া। আর এভাবে ঘামে ভেজা পচা আধপচা খাটো ধুতি বা লুঙ্গি ফেঁসে গিয়ে বেআব্রু। পাশের জন হয়ত একটা ছোট্ট ঢিল আলতো করে ছুঁড়ে দিয়ে সতর্ক করে --- ওগো ছোবান চাচা, তুমার কানে মাটি। কানে মাটি বললেই চাচা বুঝে বুঝে যায় তার বেআব্রু অঙ্গের কথা। যথাসম্ভব দ্রুত লজ্জাস্থান ঢেকে নিয়ে আবার ভাতের বেলার দিকে অপেক্ষা করা। কিন্তু ভাত বললে ভাত। খেতে মুনিষ হলে গৃহস্থ বউয়ের চৌদ্দ মাড়িতে টান ধরে জলখাবারের ব্যবস্থা। তারপরও আছে বিশ মুনিষের ভাতের হাড়িতে ফ্যান গালা, দশ নম্বরি কড়ায় ডালের মউ চাপাতে গাঙ গঙ্গা শুকিয়ে যায়। আরো আছে রাঁধা, আনাজ তরকারি গোয়াল কাড়া, উঠোন ঝাঁট, সন্তাননের যত্নআত্তি এসব করে নাওয়া খাওয়ার সময় কখন? সন্ধ্যা হতে ক্লান্ত শরীর ঘুমে ঢলে পড়ে। স্বামী লোকটার সখ আদ মেটায় কে? সেজন্য

সে আফশোষে বলেই ফেলত --- গৃহস্থের বউ হলে কি হবে, আসলে তো মুনিষখাটার মাগ। আর মুনিশ তো নয় এক একটা আস্ত কুমির। খাওয়ার ব্যাপারে পেটাক্তি পুরের বড়ো নামডাক। খাওয়া তো নয় যেন ডান হাতে অবিরাম বেলচা মারে। চাষি বৌ সেদ্ধ শুকনো ধান ঢেঁকিতে ছেঁটে গা গতরের ঘাম ঝরিয়ে রান্নাবান্না শেষ করে তখন দুপুর গড়ানি খায়। খেতের চাষি বাঁক বোঝাই ভাত নিয়ে যখন মাঠের দিকে হাঁটা দেয় তখন চারগাঁয়ের অভুক্ত ন্যাংটো শিশুরা হামলে পড়ে। এরকম অভিজ্ঞতার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তখন ক্লাস এইট শেষ করে ক্লাস নাইনে ভর্তি হয়েছি। আমার দাদু আমাকে বলল--- আজ যখন রোববার কামাই আছে তখন দুপুরবেলা মাঠে ভাত নিয়ে যা। বোশেখ মাস। ভ্যাপসা গরম। আকাশে ভাসমান ছেড়া ছেড়া মেঘ। দাদু বললে ---- যদি পানি হয়, বর্ষা নামে তাহলে ভাত ফিরিয়ে আনবি চটপট। আমি এককথার অর্থ জানি। মুনিষে ভাত খাওয়ার আগে যদি বৃষ্টিজনিত কারণ কাজ কামাই হয় তাহলে ওই দিন সেই মুনিষ দুপুর অবধি কাজ করলেও কোনো দাম পাবে না। কিন্তু দুপুরবেলা ভাত খেয়ে ফেললেই অর্ধেক দাম। এজন্য মজুরের দল চাইত গৃহস্থের ভাত যেন বৃষ্টির আগে এসে পড়ে। গৃহস্থও তেমনি মেঘের আবাহ আঁচ করে গড়িমসি করত। দাদুর কথা পেটাক্তিপুরের। সেই ভীষণ ভার নিয়ে চুদাড়ি মাঠের কাছে যেতেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। আমি ভাতের বাঁক কাঁধে নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম। কিন্তু পেটাক্তিপুরের মুনিষের বাজপাখির চোখ। আমাকে ফিরে যেতে দেখে খেত থেকে দৌড় তুলল। তাদের পিছু পিছু ছুটে আসছে অন্তত খান দশেক ন্যাংটো অভুক্ত শিশুর কঙ্কাল। আমি ওদের আগে ছুটতে পারব না জেনেও ছুটছিলাম। কিন্তু সামনে একটা বড়ো আলে হোঁচট খেয়ে পিছলে সজোরে পড়ে গেলাম। ডাল তরিতরকারি সমেত ভাতের ঝুড়ি উল্টে গেল মাটিতে। আমার কিছুই করার ছিল না। আমি সেই ঘনঘোর বর্ষার দ্বিপ্রহরে চুদাড়ির মাঠে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম পেটাক্তিপুরের মুনিষের সঙ্গে এক দঙ্গল ক্ষুধার্ত শিশু ছড়িয়ে পড়া ভাত ডাল তরকারি কীভাবে পরম তৃপ্তি সহকারে খেয়ে যাচ্ছে।

এখন দিন পাল্টেছে। খেত মজুরের আগের দুরবস্থা আর নেই। ঘন্টা মেপে মজুরি আদায়ে সচেতন। তাদের উত্তরপুষের কব্জিতে হাতঘড়ির কাঁটা ঘোরে। যতটুকু কাজ সেই অনুপাতে মজুরি আদায়। না দিলে পঞ্চায়েত আছে। লেবার অফিসার আছে। দু'মুঠো ভাতের তোয়াক্কা কে করে? মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামে বেলা একটায় মাইকের আজান হলেই থাকল গেরস্থের বাকি কাজ। অথচ আর দশ মিনিট কাজ করলেই আঁটি বাঁধা ধানগুলো পোঁতা হত। বৃষ্টি নামলে এই ধান ভিজবে পচবে তাতে মুনিষের কী? নগদ টাকা না দিলে পঞ্চায়েত পর্যন্ত কে আর কষ্ট করে হেঁটে যায়। গোয়ালের খোঁটা থেকে গ খুলে বেচে দাও বটতলার হাটে। বেচারি চাষির কিছু বলার নেই, গ্রাম সালিশি তার পক্ষে যাবে না। খেতমজুরেরা সংখ্যায় বেশি। তাই ভোটও বেশি। দহকুল্লার হারাধন তাদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি। বলেছিল আজ শুত্রবার, বাংলাদেশ টিবিতে জববর ছিরিয়াল আচে ----

সেই হারাধন মণ্ডল সেদিন আক্ষেপে বলেছিল --- ভগ্‌বান, ফিরে জন্মে যেন মুনিষ খাটার ঘরেই জন্মায়।

হ্যাঁ, এখন মুনিষখাটার সুখ বটে। আগের মতো সামান্য টাকার মজুরিতে দিনান্তের পরিশ্রম নয়। খেতে খামারে ফুরন কাজের রেওয়াজ হয়েছে। পাশাপাশি বুড়োবড়া মানুষ কাজ হারিয়েছে। তারা ওই উঠতি বয়সের ছেলে ছোকরাদের সাথে পাল্লা দিতে পারবে কেন? ওরা এখন সকালে সন্ধ্যায় চায়ের দোকানে আড্ডা মারে। ফি হপ্তায় সিনেমা দ্যাখে, মাঝে মাঝে মুসলমান এলাকার মজুরের দল চাঁদা তুলে গ কেটে খায়। একে বলে 'ভাগা'। প্রতি গ্রামেই এখন একটি দুটি ভিডিও হল। দু'টাকার চিকিট কেটে অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারে। সেখানে তারা শ্রীদেবী দ্যাখে মাধুরী দীক্ষিত দ্যাখে। পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে বাড়িতে দ্যাখে বউ। হয়তো গায়ের রং শ্যামলা, মুখে মেচেতার দাগ, বেমানান হাসি, হাঁটাচলায় নায়িকাসুলভ ছন্দ নেই। তার মনের মধ্যে ঢেউ তোলে না। জ্বালাতে পারে না কামনার আগুন। মেজাজটা চড়ে যায় তক্ষুনি। দুপুর রাতে হল-ফেরতা হয়ে দমদমাদম লাঠি চালায় বউয়ের পিঠে। বেচারি ঘুমের ঘোরা আচমকা চিৎকার করে ছুটে পালায়। পাড়াপ্রতিবেশী দু'চার জন জেগে ওঠে। আরও লাঠির বাড়ি পাওনা আছে ভেবে বউটি ঘরে যেতে ভয় পায়। পাড়ার নকুরদ্দি কী আর করে, রাতের মতো বউটিকে জায়গা দিলে আর সকালবেলা তালাক হয়ে গেল। খান্‌কি নকুরদ্দির সঙ্গে লষ্ট হে

াচে রাতে। উরে তিন তালাক রয়েন দিলাম।

সেদিন বাড়িতে বিদেকাঠির প্রসঙ্গ উঠতেই আমার বড় ছেলে দোলাবীর বলল ---- বিদে কাঠি কী বাবা? ভীষণ রাগ হল। বললাম গ্রামের ছেলে হয়ে বিদে শলো চেন না? বললে --- চিনব কি, নামই তো শুনিনি। ছেলেকে আর বেশি কিছু বলতে পারিনি। শুনেছি, ঢেঁকি নাকি যাদুঘরে স্থান পাবে। কিন্তু বিদেকাঠির নাম ক'জন পণ্ডিত কানে শুনেছেন? চোখে দেখেছেন কজন? মনে পড়ে স স দশ বারোটি লোহার পাত কামারশালায় পিটিয়ে হুল করে সম্বা কাঠের সঙ্গে আটকানো থাকত। জো কালে বলদ জুতে দিলেই সারা মাঠে চিনি চালাত। বিদেকাঠির খোঁচায় যে পাটালির মতো হালকা মাটি উঠে আসে তাকে বলে চেলি। মাটি বেশী শুকিয়ে গেলে বড় চেলি উঠে এলে চারা গাছ উপড়ে যায়। আউশ ধানের এরকম চারাকে বলা হয় জাওলা । জো কালে এক বিদোতে কয়েকশো মুনিষ বাঁচে চাষির। সে জন্য বলা হত ---
ইদের দিনে বিদের জো
পীর পার্বণ নামাজ থো।
আরো আছে,
মা মরলে বিষম জ্বালা
তবু খেতে বিদে চালা।
বিশ বিঘে জমির আবাদ সারা
ডিঙুলিতে ঘাস মারা।

অর্থাৎ ইদের মতো পার্বণ বা মা মারা যাওয়ার মতো বিপদকালে বিদের আবাদকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এতেই একদিনে বিশ বিঘে জমির আবাদ হাসিল হয় আর ডিঙুলিতে অর্থাৎ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে দ্রুত ঘাস মারা যায়। এখন সেই বিদে নেই আউশ চাষও নেই। হেতো আউড়ি ব্যানামুড়ি ধানের বীজও চোখে দেখা যায় না। পূর্ব পুষের মুখে শুনেঠি 'যে বনুবে কেলে সে পুষবে মাগ ছেলে। যে বুনবে মুদো তার ছেলে হবে কুঁদো।' এখানে কুঁদো কথার অর্থ কোঁতলা বা স্বাস্থ্যব ান। শুনেছি, মুদো ধানের ভাত খেলে কামশক্তি বাড়ে। কেউ ওই ভাতের আমানি চাইতে এলে তখন খুব সহজে বুঝে নিতাম তার ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে গিয়েছে।

বর্তমান উন্নত কৃষি প্রযুক্তি যুগে সব কিছু আমূল পাল্টে গিয়েছে। মাঠে ডিজেল পাম্প সেটের গড়া শব্দে কান পাতা দায়। ইলেক্ট্রিক তারে তারে সেলাই করা মেঠো আকাশ বৈদ্যুতিক মোটরেও জল তোলে পাতাল থেকে। আগের মতো মানুষ আর আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের রকমসকম আঁচ করতে পারে না। তাদের নজর এখন পাতালের দিকে। স্যালো প াইপের মুখে উঠে আসা মিহি বালি, ঝিম দানার বালি পরখ অনায়াসে বলতে পারে অফুরান জলের খবর। সেই জল বুঝি আর উঠে আসতে চায় না। দিনে দিনে জলতল নেমে যাচ্ছে পাতালের নীচে। বাড়ছে ডিজেলের দাম। চাষির মাথায় হাত। ওদিকে চাষি বউকে পেটাস্তিপুরের মুনিষের জন্য আর ভাতের ফ্যান গালতে হয় না। জলখাবারের মুড়ির প্যাকেট এসে গিয়েছে পাড়ার মুদিখানায়। গ্রামে গ্রামে চাল কল। ঢেঁকিকে স্বর্গে গিয়ে আর ধান ভানতে হবে না। বাটনা বাটার তালে ত ালে নারী শরীরের অদ্ভুত দোলা, হাতের শাঁখা চুড়ির রিনঠিন শব্দ আর তেমনভাবে শোনা যায় না। এখন গুড়ো মশলার যুগ। কাজ নেই চাষি বউয়ের খাওয়া আর শোয়া ছাড়া। এত সুখেও অশান্তি কাটে না। ঘন ঘন গ্যাস অম্বল বদহজম, স াদা স্রাব, মাসিকের গোলমাল, তলপেটে শিয়াকুল কাঁটার খোঁচা। কী আর করা যাবে। পাঁজা কোলা করে তোলো ভ্যান রিক্সায়। সদর শহরের গাইনো ডঃ মদন ভট্টর কাছে ঘন ঘন যাওয়া আসা। ডঃ ভট্টর প্রেসত্রিপশন নয়ত রেজিস্ট্রি কে ার্টের দলিল। চাষি লোকটা কী করবে? সাড়ে চারশ টাকা দামের এন পি কে-- এর বস্তা কিনবে না বউকে ডাক্তার দেখ াবে। পেটে বাচচা এলেই সোজা পথ বাতলানো 'সিজার'। একদিন জিজ্ঞালা করলাম টানাপুরের বিহারী ঘোষকে --- ক াকা, আজকালকের ছেলেমেয়ে বাপকে ভাত দেয় না কী কারণ?

আমার প্রশ্ন শুনে হো হো করে হাসলেন বিহারী কাকা। বললেন --- এ তো মামুলি প্রশ্ন ভাইপো। আগের দিনে ছেলেরা বাব
া মাকে সেবা যত্ন করত। এখন করে না; এই তো? আমি বললাম, হ্যাঁ। সেটাই জানতে চাই।

শোনা, আজকাল সন্তান প্রসব হয় অজায়গা দিয়ে।

অজায়গা? আমি অবাক হই । স্ত্রী জনন অঙ্গকে এতদিন অজায়গা বলে জানতুম। বললাম, সন্তান প্রসবের জায়গা তো একটাই।

বিহারী কাকা দ্রুত মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করলেন। বললেন --- আজকাল বেশিরভাগ তো সিজার হচ্ছে পেটে কেটে। ওট
াই অজায়গা। মা তাকে কত কষ্ট করে প্রসব করল তা সে অনুভব করবে কী করে? বাবা মায়ের প্রতি সন্তানের মায়া মমতা আসবে কোত্থেকে। আর অজায়গা দিয়ে যে সন্তান জন্ম নেয় তার স্বভাব চরিত্র কখনোই ভালো হবে না ভাইপো। দেখে নিও।

বিহারী কাকার ডাক্তারের চেয়ে ভেষজ ওষুধের প্রতি বিশ্বাস অনেক বেশি। সেদিন কথায় কথায় কাব্যের আকারে ভেষজ ওষুধের গুণকীর্তন করেন -----
শিরঃপীড়ার মহৌষধ ওলটকম্বল ডাঁটি
সর্বপ্রকার আমাশয়ে থানকুনি খাঁটি।
পেটেতে কৃমি হলে চিরতার জল
ফোঁড়া ফাটাতে লাগে পায়রার মল।
অনিদ্রার গি খাবে শুষনির শাক
কামশক্তির শিমূল শিকড় নাই রাখ ঢাক্।
ন্যাবা হলে কাঁচা হলুদ ইক্ষুর গুড়
চোখ ওঠা নিরাময়ে লাগে হাতি শুঁড়।
জিওলের ছাল খেলে গর্ভনাশ হয়
হাঁফানিতে বাসকপাতার ফল অতিশয়।

ন পাড়ার কায়েম কলিম মালি মল্লিক দুই ভাইকে আমি চিনি। চিনতাম তাদের বাবা কিতাব মল্লিককেও। এরা বাবার কাছ থেকে কিছু কিছু মন্ত্র শিখেছে। সাপের বিষ ঝাড়ার ওস্তাদ কায়েম। গাঁয়ের বউদের বুকে ধুনকো ঝাড়ে এই মন্ত্রে

ঠুনকো ঠুনকো ঠুনকোর ঝি
পথে বসে কর কি।
পুকুরপাড়ে তালগাছটি
সেথায় ঠুনকোর বাসা
খুদ খাই কুন বাছি।
তেমনিভাবে আধকপালে ঝাড়া
আধকপালে বিদায় ঠাকুর
আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম
ভাঙা দইয়ে থাকিস
ভাঙা দইয়ে যে জল দিয়ে না খায়

তারে আমি বাগা বাই
তুমি কে হে?
আমি শ্রীমন্ত্র পাটনী ---- শীঘ্র পার করে দে।
কলিম মল্লিক বহুদিন ধরে সন্তান কামনায় গাঁয়ের বউ ঝিদের ঝাড় ফুঁক করে। তার কাছে শোনা এই মন্ত্র ----
আসুক মাতা বসুক মাতা
উড়ে যায় কোন কোন দেবতা।
ঘুঘরো ঝি ঝি মালপোকা
মধ্যে মধ্যে জোনাকি পোকা
যদি কই মিথ্যে কথা
পৈতে কেটে গুতে ফেলাই
শনিবার দুপুর বেলায়
গিয়েছিলি বিটি নিমতলায়?
তোর মারিন চেড়ে বাও লেগেছে
হবে পুত্র রবে না
তোকে মা বলে আর ডাকবে না
নিয়ে স’পাঁচ আনা পয়সা বিটি
এক পালি চাল
তোকে মাদুলি দিয়ে যাই।

কলিম নল্লিককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সওয়া পাঁচ আনা পয়সার এখন কি দাম আছে? আমার প্রশ্ন শুনে বললে, হক কথা। এখন তাই বলি ---- নিয়ে আয় বিটি পঞ্চাশ টাকা নগদ আর চাল দুই কাঠা। সন্তান সদি না হয় বিটি পুষিষ নামে পাঁঠা।

শৈশবে পীর পার্বণের সময় দেখছি রান্নাঘরে বেড়াল বাঁধতে। কিন্তু কেন বাঁধা হত এর সদুত্তর তেমনভাবে দেওয়া ,সম্ভব নয়। তবু মনে আছে একটি বেড়াল কাঁধে নিয়ে পাড়ার ফজলে চাচা দশ বারোটা বাড়ি ঘুরে বেড়াত। আমরাও ছোটো ছে াটো ন্যাংটা আধ ন্যাংটো শিশুরা তার পিছু নিতাম। ফজলে চাচা গরিব মানুষ। পার্বণ করায় এখনো অনেকে পার্বণের কৌলীন্য বজায় রাখতে বেড়ালের তল্লাসি করে। কেউ একজন বেড়াল বেঁধে পার্বণ করলে বাড়ির বউ কেন বলবে না, মা ষষ্ঠীর বাহনটাকে বেঁধে রাখার সাধ্য নেই যাদের, সে বাড়িতে কেন বে দিলে বাবা। এমন মনস্তাপই সে সময় মেয়ের বাবা পাত্রের বিষয় সম্পত্তির হিসাব নিকাশের সঙ্গে এই নগণ্য বিষয়টিকে কৌলীন্যের একটি বড়ো মাপকাঠিতে যাচাই করত। হতে পারে বড় পার্বণের আমিষগন্ধে বেড়ালের উৎপাত এড়াতে পূর্বেকার কোনো গিন্নি ঠাক্‌ন বেঁধে রাখতেন। সেই বেঁধে রাখাটাই প্রথা হয়ে দাঁড়াল।

টিকটিকির ডাক সত্যের প্রতিষ্ঠা করে বলে যেমন মেনে নিই, তেমনি হাত থেকে ঝনঝনিয়ে থালা বাসন পড়ে গেলে ধরে নিতে পারি বাড়িতে নির্ঘাৎ অতিথি আগমন ঘটছে। মেয়ে মানুষ দরজার ঝুন কাঠে বসলে নাকি ছেলে হতে কষ্ট পায়। ছেলেবেলায় ঠাকুমাকে বারবার বলতে শুনেছি খবরদার, খাবার সময় এদিক সেদিক উঠে যাসনি; বিয়ে ভেঙে যাবে। মনে আছে একই সঙ্গে দু’জনে আগুনে ফুঁ দিয়ে ফেললে গলায় ব্যথা হবার ভয়ে, পরস্পরের গলায় চিমটি কাটতাম। আবার খেলতে খেলতে কেউ কলাগাছের গায়ে পেচছাপ করলে তাকে নুঙ্কু ফেলার ভয় দেখাতাম। বলতাম, গাছের গায়ে নুন অ ার চুনের ছিটে দিতে হবে।

এখন বুঝি নুন ও চুন জীবাণুনাশক। থোড়টাও খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করি। খাবার সময় চঞ্চলমতি শিশুদের ইতিউতি উঠে

যাওয়ার ক্ষেত্রে বিয়ে ভাঙার অনুশাসন। কিন্তু যখন শুনতাম শনিবারে সূর্যাস্তের কালে কাক মেরে তার চোখের মণি গলিয়ে দণ্ডমুণ্ডে লাগালে বিশ পুষের মর্দানা বাড়ে। এর কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি।

আবার অনেকের মুখে শুনেছি, মুখে ছুলির মতো সাদা দাগ হলে রজঃপট্টি বা ঋতুপট্টি হলো মহৌষধ। এক্ষেত্রে মেয়েরা অধিক কার্যকর। রজব বা ঋতুপট্টি হল মাসিকস্রাবের প্রথম দিনেই --- পরিস্কার সাদা ন্যাকড়ায় রঞ্জিত করে মুখমণ্ডলে লেপন দিয়ে অন্ধকার ঘরে কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ বসে থাকা। পর পর তিন মাসে এরকম তিনবার পট্টি লাগাতে প ারলেই অবাঞ্ছিত সাদা দাগ উঠে যায়। রোগ ব্যাধির কথা যখন এসেই গেল তখন আর একটা দাওয়াই --- এর কথা অ ালোচনা করা যাক । কোনো কুমারীর জারজ পুত্র সন্তানের প্রস্রাব মাটির পাত্রে ধরে রেখে কোনো দৃষ্টিদীন মানুষের চোখে ঝাপটা দিলে তৎক্ষণাৎ পূর্ণ দৃষ্টি ফিরে পায়। কিন্তু চক্ষুষ্মান ব্যত্তির ক্ষেত্রে ফল হবে তার বিপরীত। জারজ সন্তানের এরকম প্রস্রাবকে বলা হয় মদনবারি।

মুখে ছুলি বা সাদা দাগের নিরাময়ের ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন হয় রজঃপট্টি বা ঋতুপট্টি তেমনি মেয়েদের শরীরে দাদের মত চর্মরোগ হলে প্রয়োজন একডেলের আঠার। কথাটার মধ্যে ব্যঞ্জনা আছে। একডেলে কথাটার অর্থ একটি ডাল যার, তার আঠা। অর্থাৎ পুংবীর্য।

আমার একবার চোখে আঞ্জনি হল। গাঁয়ের ডাক্তার বললে, এর জন্য কোনো ওষুধের দরকার হবে না। আপনা আপনি সেরে যায়। পরদিন চোখ ডেক্রে উঠল ফুস্কুড়িটা বড় হল। আমাকে বাড়ীর দু'একজন বললে, কোনো বাচচা ছেলের নুঙ্কু ঠেকিয়ে নিতে। আমি শুনেছি এতে নাকি আঞ্জনি সারে। আমি পাশের বাড়ীর সাহিদা চাচির উঠোনে দাঁড়ালাম। বললাম, চাচি চোখ নিয়ে ক'দিন কষ্ট পাচ্ছি , তুমার ছেলের ওটা যদি একবার ঠেকিয়ে দাও। চাচির কোলে ছমাসের দামাল পুত্র দুধ টানছে। আমার কথা শুনে চাচি বললে না বাবু , ছেলের আমার অনহিত হবে। করিম চাচা দ্যারাতে পাটের বেতে কেটে দড়ি পাকাচ্ছিল। বললে--অনহিত কী হবে গো? চাচি বললে ধবজভঙ্গ রোগ হয় শুনেছি। অগত্যা ফিরে যাবার উদ্যোগ করছি। এমন সময় করিম চাচা উঠে এল কবে কী হবে না হবে তার জন্য ছেলেটার চোখটা নষ্ট হয়ে যাবে? সাহিদা চাচি আর কথা বলতে পারল না। আমি ওই ছমাসের দামাল ছেলের নুঙ্কু যেই চোখে ঠেকিয়েছি , অমনি বদমাসটা সজে ারে ডান চোখে পেচছাপ করে দিল। করিম চাচার ছেলের ধবজভঙ্গ তো হয়নি উল্টে বড়ো হলে বদমাসটি নকুরদ্দির মেয়েটা নিয়ে পালিয়ে বিয়ে করল।

গ্রামাঞ্চলে এঁড়ে গ কাটান বা নিবীর্যকরণ করে বলদে পরিণত করা হয় তেমনি এঁড়ে মোষকে বলা হয় ন্যাথাড়। ন্যাথাড়ের বদমায়েসি ঝোঁকের বাড়বাড়ন্ত হলে তাকেও কাটান দেওয়া হয়। নইলে চাষের কাজে বাগ মানানো দায়। গ্রামের মুচিই ক াটানের কাজটি সমাধা করে। যে মুচি কাটানের কাজটি করে থাকে সমাজে তার মান্যতা বেশি। এজন্য তাকে মিস্ত্রি বলা হয়। কাটানের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্ডকোষে ঘা পুঁজ সহ পোকা জন্মে। এতে ক্ষতস্থান ভালো হতে দীর্ঘ সময়ের টালব াহনা। এ থেকে নিস্তার পেতে প্রয়োজন এলাকার সাতজন বড়ো মাপের সুদখোরের নাম। একটি সাদা কাগজে পরপর নাম লিখে কাটান দেওয়া গ বা মোষের অন্ডকোষে বেঁধে দিতে হয়। আর সেই সঙ্গে এই মন্ত্র পড়লে ক্ষতস্থান থেকে ঝরঝর করে পোকা ঝরতে থাকে ----

কাটান কাটান কাটান মন্তর
আমি এক গুপীযন্তর।
সাত গাঁয়ের সাত সুদ খোর
লিখে ফেলি কাগজ ভিতর।
দামড়া গর অন্ডকোষ
কাটান দিলে মহাভোজ।

ঘা পুঁজ আর শূল টাটানি
লক্ষ পোকার ছটফটানি।
হে পোকা তুই নেমে আয়।
ওরা পাঁচ গরিবের রক্ত খায়।

আমি একটু লেখাপড়া জানার সুবাদে গাঁয়ের কেউ গ মোষ কাটান দিলে তারা আমার কাছে ছুটে আসত। সাতগাঁয়ের সাতজন সুদখোরের নাম কাগজের টুকরোতে লিখে দিতে হত প্রায়ই। এতে আমার অস্বস্তি হত না, বরং ভালো লাগত এই ভেবে যে এই অধমের কালিতে একটা অবলা প্রাণী জ্বালা যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবে। একদিন পাড়া সম্পর্কীয় ওসমান চ াচা লিখতে এলে গোপন সাতজন সুদখোরের পরিবর্তে সাতগ্রামের হাজি সাহেবের নাম লিখে দিলাম। রাতে শুয়ে আম ার ঘুম হল না। সারারাত ঘর উঠোন করছি। বারবার মনে হচ্ছে সাতজন পবিত্র আত্মার নাম লিখে ভীষণ পাপ কাজ করে ফেলেছি। আল্লাতলা বলে যদি কেউ থেকে থাকেন নিচয় আমাকে দোজখে পাঠাবেন। সকালে উঠে আমি ওসমান চাচার বাড়ি গিয়ে বললাম --- চাচা, কাগজটা ঠিকমত লেখা হয়নি, ওটা আমাকে ফেরত দাও। তোমাকে ভালো করে লিখে দেব। উসমান চাচা বললে --- না বাবা, তোমার লেখার হাত ভালো। কাগজটা বেঁধে দিতেই বিকেল থেকে পোকা ঝরতে শু করেছে। ওই দ্যাখ গটা ক'টা দিন অনাহারে থেকে ছানিতে মুখ দিয়েছে। ওসমান চাচার কথা শুনে সেদিন সুদখোর মহ াজন আর সাত গাঁয়ের সাতজন হাজি সাহেবের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে পারিনি।

সমাজে আইবুড়ো মেয়ে গর্ভধারণ করলে স্বাভাবিকভাবে পাড়া পড়শির কানাকানির অন্ত থাকে না। গাঁয়ের সহজ সরল মানুষ বিপদে আপদে একে অপরের হিল্লে হয় তেমনি সুযোগ পেলে ক্ষতি করার ধান্দায় মাতে। পারিবারিক বিবাদের ক ারণেই হোক কিংবা লোকসমাজে হেয় প্রতিপন্ন করার কারণেই হোক ওই অভাগী মেয়েটা যাতে কোনোদিন প্রসব করতে না পারে তার জন্য যে ফন্দি আঁটা হয় তাকে বলে 'পেট বাঁধনো'। এটা একটা মারাত্মক তুক। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে খেয়া নৌকোর সাতটি গজাল তুলে কোনো বন্ধ্যা তালগাছে হাতুড়ির একটি আঘাতে আমূল বসিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কঠিনতম কাজ হচ্ছে গজাল তোলা। ব্যর্থ হলেই বিষম বিষদ। ওই অমবস্যার রাতে যতসব জলজ অপদেবতা খেয়াঘাটে পৌছলেই বিকট মূর্তিতে তেড়ে আসবে; নয়ত চুবিয়ে মারবে গাঙের গাবায়। তাদের ওখানে থেকে হঠাতে মন্ত্রবাণ ছুঁড়ে দিতে হয়।

এভাবে মন্ত্রের ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে দিতে পারলেই সমস্ত জলজ পিশাচ-পিশাচিনীর দল বিকট আওয়াজে জলের মধ্যে বিলীন হয়ে সাবে। তারপর এক নিশ্বাসে সাতটি গজাল তুলে নগ্ন অবস্থাতেই পুঁততে হবে সেই বন্ধ্যা তাল গাছে। কিন্তু সেখানেও অনেক বাধা বিপত্তি। হাতুড়ির একটি আঘাতে একটি গজাল পুঁতে দিতে ব্যর্থ হলেই গাছের উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলবে মা টিতে। গজাল পোঁতার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রোচচারণে ওস্তাদকে স্মরণে করতে হয়।

ছোটোবেলায় আরও নানান কুসংস্কারের কথা শুনেছি। যেমন ---কেউ যদি ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে শেয়ালের রমণ দৃশ্য দেখে তাহলে তার পরধন প্রাপ্তি ঘটবে। বর্ষায় মোষের পিঠে কাকের রমণ দৃশ্য দেখলে নির্ঘাত বজ্রাঘাতে মৃত্যু ঘটবে। শকুনের মিলন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলে শতাধিক বছর পরমায়ু লাভ করবে। আবার শেয়ালের রমণ দৃশ্য কেউ দেখুক আর ন াই দেখুক ধানখেতে সংঘটিত হলে প্রচুর ধান হয়। ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যার দাবনায় বড়ো ফোঁড়া হয়। ফোঁড়ার পরিধি যত বড়ো হবে তত বড় তার গোলা বাড়ি হবে। এখানে ফোঁড়া হল গোলার প্রতীক। মা লক্ষী উপুড়হস্ত হয় কারো বাবা মরলে; জমিতে যাচ্ছে তাই ফসলের ফলন বাড়ে। ফলে সেও গোলা বানায়। এরকম মৃত্যুজনিত ফসলের বাড়---বাড়ন্তকে বলে মরা কিষ্টি।

খাওয়া নিয়ে বেশ কিছু কুসংস্কার রয়েছে এখনো। মেয়েরা জোড়া কলা খেলে যমজ সন্তান হয়। কালি কলাইয়ের ডাল

খেলে সন্তানের গায়ের রং কালো হয়, গর্ভবতী অবস্থায় বেল খেলে সন্তানের মাথায় চুল ওঠে না। ওই অবস্থায় খেজুর খাওয়ার সাধ জাগলে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রেহাই পেতে এখনো অনেক কুসংস্কার বিদ্যামান। প্রবল ঝড় ঝাপটায় সময়ে হিন্দু সমাজের মায়েরা খই মুড়কি চিড়ে গুড় একটি থালায় সাজিয়ে উঠোনে রেখে দেয়। বিশ্বাস পবনদেব ঐ প্রসাদে তুষ্ট হয়ে ঝড়ের প্রকোপ থেকে রেহাই দেবেন। মুসলিম সমাজে ওই একই খাদ্যদ্রব্য উঠোনে রেখে দেয় একটি নামাজের পাটির উপর। যাতে ঝড়ে ফেরেস্তা ওই ইফতার গ্রহণ করে উঠোনে নাম পড়বেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। সময়টা আশির দশকের শেয়। সবে জষ্ঠি মাস। শেষ বিকেলে ঝড় উঠতে দেখে আমার আশঙ্কা হচ্ছিল মাঠে পাকা বোরো ধান ঝরে যাবে। কিন্তু ঝড় যে এত ভয়ংকর আকার ধারণ করবে ভাবিনি। একটানা গোঁ গোঁ আওয়াজ। ঘর টিনে ছাওয়। গোলার ছাউনিও টিনের। ঝড়ের দাপটে চাল কাঁপিয়ে মড় মড় আওয়াজ হচ্ছিল। বাবা নামাজি মানুষ। বললেন --- আলো রছুলের নাম নে। ছেলেগুলো হয়েছে সব বে -- নামাজির ধাড়ি। নইলে গজব আসবে কেন?। বলে ঝড় থামানোর জন্য উঠোনে দাঁড়িয়ে উচচ রবে আজান হাঁকাতে শু করলেন। আমরা ক'ভাই দুটো বউ আর মা গোলা আর ঘরের পশ্চিম দিকের চাল ধরে কান্নাকাটি করছি। সত্যি বলতে কি আল্লারছুলের নাম নিতেও ভুলে গেছি। মা আগেই চিড়েগুড় ওজুর পানি নামাজের পাটির উপর রেখে দিয়েছে। বাবারও বিশ্বাস ছিল ঝড়ের ফেরেস্তা ঐ ইফ্তার গ্রহণ করবেন। আর এই মক্তকায় তাঁর সঙ্গে নামাজ পড়বেন। হঠাৎ একটা দমকার দাপটে গোলার চাল উঠে আসতে দেখে বাবা আজান থামিয়ে হড়কে ঘরের মধ্যে। আমি হামা টেনে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দেখলাম নামাজের পাটি নাস্তার পাত্র ভোগের জন্য ঝড়ের ফেরেস্তা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বাবার আর ফেরেস্তার সঙ্গে নামাজ পড়া হল না।

আগে পটল চাষ হত আমাদের। এই চাষ নাকি ভীষণ রকমের শুচিবাইগ্রস্ত। খেতে মেয়েদের পর্দাপণ ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আমার দাদু আমাদের পটল খেত দেখাশুনা করত। দাদু কিছুতেই তার ঘিরে রাখা খেতের ভিতর আমাকে ঢুকতে দিত না। বলত তোরা সব মুতে পানি দিস না। রাতে কুস্বপ্ন দেখে তোদের শরীল নাপাক। জমিতে ঘাস হলে মসজিদে নামাজ পড়া আধবুড়ো নামাজিদের মুনিষ করে নিড়ানি দেওয়া হত। তাদের মাথায় থাকত টুপি। পরনের লুঙ্গি ছড়ানো থাকত পা পর্যন্ত। মাঝে মধ্যে মসজিদের ইমাম সাহেবের পানিপড়া ভোরে ছিটিয়ে দিত। মাঝে মাঝে বিভিন্ন ওঝা গুণিনের আগমন ঘটতে দেখতাম। তারা চাষিদের প্রলোভিত করে টাকার বিনিময়ে কিছু শিকড় বাকড় আর মন্ত্রবিদ্যা দান করত। ওই শিকড়গুলো মন্ত্রযোগে যথাস্থানে পুঁতে দিলে রাতের মধ্যে পরের খেতের পটল গড়াতে গড়াতে নিজের খেতের লতায় লেপটে যায়। এরকম ঘটার আশঙ্কা থাকলে দাদুর হুকুমে আমরা ছেলে ছোকবার দল আলের ফাঁস জাল কিনারে পেতে সারারাত বসে থাকতাম যাতে আমাদের খেতের পটল অন্যের খেতে পালিয়ে না যায়। শুনেছি শনিবার অন্ধকার রাতে কালো বিড়াল জ্যান্ত অবস্থায় খেতের মাঝখানে পুতে দিলে অসম্ভব ফলন বাড়ে, কিন্তু এতে নাকি বংশের অনহিত হয়। আগে পটল খেতের আলে দাঁড়ালেই একটানা ভ্রমর মৌমাছিদের গুণ গুণ মিষ্টি আওয়াজ শুনতে পেতাম। পরাগমিলনকারী কীটের সংখ্যা কমে গিয়েছে। যার ফলে প্রতিদিন সকালে খেত মালিককে মুনিষ করে কৃত্রিমভাবে পরাগ মিলন ঘটাতে হচ্ছে।

আমি তখন নেহাত ছোট। খাৎনা বা মুসলমানিও হয়নি আমার। মনে আছে সারা মুখে ছোটো ছোটো ফুসকুড়িকে গ্রাম্য ভাষায় বলা হয় বামুনহাটি। এর দাওয়াই হল শিশুকে কোনো বামুনের এঁটো ভাত খাওয়াতে হবে। আমার দাদিরও সেই মত। মুখে ঘা ব্যথা হলেও বামুনবাড়িতে ভরপেট খাওয়ার লোভ জন্মাল। দাদির হাত ধরে মাঠ পেরিয়ে ন্যাংটো অবস্থায় পাশের গ্রাম গুদ্দুড়িতে পৌঁছলাম। ওখানে একঘর বামুনের বাস। পাঁচ সাতটা গ্রাম ঘিরে যজমানি। বামুনের নাম ভগন্নাথ ঠাকুর। আমি সেই প্রথম তাঁকে দেখলাম কাঠবেড়ালির মতো মস্ত নাক। উদোম গায়ে দাদির সামনে দাঁড়ালেন। বললেন---- কী খবর মাসি?

দাদি বললে ---- আর বলো না বাছা; ওই দেখছ না, নাতিছোঁড়ার বামুনহাটি হয়েছে। তুমার নাম করতেই ক'দিন থেকে সমানে বলচে, দাদি নিয়ে চ, নিয়ে চ।

আমি ভগো ঠাকুরের সামনে নুঙ্কু ধরে দাঁড়িয়েছিলাম। ঠাকুরের বোধ দয় তিনটে চোখ। আমার পানে তাকিয়ে বললেন --- অ্যাাই, ওখানে কী হয়েছে রে? চেপে ধরে অছিস যে?

ভয়ে ভয়ে হতে সরাতেই দাদিও দেখে ফেললে। ঐ দ্যাখ বাবা নেনুর ডগায় সর্বনেশে কাঠপিঁপড়ে কেমড়ে দিয়েছে।

সেদিন আমার বামুনবাড়ির ভাত খাওয়া হল না। ভগো ঠাকুর বললেন ---- এতদুর রাস্তা কষ্ট করে এলে মাসি, ফিরে যেতে হবে। এখন আমার চৈতি উপবাস। দুটো দিন পরে তোমার বাড়ি গিয়ে ফলার করে আসব।

কী করব? দাদির হাত ধরে চুদড়ির সেই বড়ো মাঠ পেরিয়ে বাড়ি ফিরলাম। ভগো ঠাকুরের পৈতেটো নিয়ে লাটিম চালাতে ভাষণ লোভ হয়েছিল সেদিন। আজ বুঝতে পারি ঠাকুর মশায় কেন চৈতি উপবাসের দোহাই দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন। পাঁচ গাঁ থেকে পাঁচ সাতটা ছেলে মেয়ে হররোজ যদি ঠাকুরের পেসাদ খাব বলে হামলায়, তাহলে ও লোকটার উপায় কী! অবুঝ বালবাচ্চা থালে বসে পেট না ভরলে কাঁদন জুড়বে।

যা হোক ভগো ঠাকুর কথা রেখেছিলেন। দু'টো দিন বাদে আমাদের বাড়ির দাওয়ায় উঠে বসলেন। দাদি তার পা ধুইয়ে নতুন গামছায় মুছিয়ে দিলে। তার জন্য আনীত ফলারের সবটাই সদ্য কাটা কচি কলাপাতায় সযত্নে সাজিয়ে দিয়েছে দা দি। ফুরে প্রণামী স্বরূপ সওয়া চার আনা পয়সা। পয়সা পকেটে রেখে ভগো ঠাকুর খাচ্ছেন। দাদি পাখার হাওয়ায় ঠাকুর মশায়কে আরাম দিচ্ছে। আমি তার সামনে থ্যাপলা মেরে বসে আছি। বসে বসে দেখছি। চিড়ে, মুড়কি, মেঠাই, খান অ াস্টেক রসগোল্লা, এক বাটি ভাপ ওঠা গরম দুধ। ভগোঠাকুর নিবিষ্ট মনে এমনভাবে খেয়ে যাচ্ছেন যেন গোটা পৃথিবীতে মহাপ্রলয় ঘটে গেলেও তাঁর কোনো যায় আসে না। পাতের উপর খাবারগুলো ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল। আমার মনট া ভীষণ আনচান করে উঠল। ভগো ঠাকুরের বোধ হয় আদপেই খেয়াল নেই যে তার সামনে এক নাবালকে মুখে বামনহা টি নিয়ে হা পিত্যেশে বসে আছে। দাদি এক সময় হাত পাখা থামাল। হয়ত ভাবল গরমের ভাবে বাকি নাতির জন্য রেখে দেবেন। কিন্তু সদ্য চৈতি উপবাস কাটিয়ে যে ঠাকুর ফলারে বসেছেন তাকে সামলায় কে? সবটা সাবাড় করে ভগো ঠাকুর যখন গলা তুলে বললেন --- মাসিমা, আরো কিছু ফলার লাগবে যে। বুঝলে না সদ্য চৈতে -----

আমি গলা ছেড়ে ভেবড়ে কেঁদে ফেললাম।

গুদ্দুড়ির বামুনের এঁটো ভাত না খেয়েই আমার বামনহাটি সেরে গেল। এর পরের বছর আমার খাৎনা বা মুসলমানি হয়েছিল। এখন এই অনুষ্ঠানের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। সারারাত বাড়িতে ভিডিও অনুষ্ঠান। উপহার হিসাবে আত্মীয় স্ বজন নিয়ে আসে হাতঘড়ি, আংটি, সাইকেল, গলার চেন, জামা প্যান্ট। এসব উপঢৌকনের কথা আগেও বলেছি। দেখে শুনে মাঝে মাঝেই ওস্তাদের সামনে আবারও ন্যাংটো হয়ে বসে পড়তে ইচ্ছে করে।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com